৩। **মদিনার মসজিদ সংস্কার ঃ** বিখ্যাত ভূগোলবিদ আল-মাক্‌দিসী দশম শতাব্দীর শেষভাগে এ মসজিদ পরিদর্শন করে এর স্থাপত্য সৌন্দর্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। কালের বিবর্তন সত্ত্বেও উমাইয়া মসজিদটি মুসলমানদের নিকট পৃথিবীর চতুর্থ আশ্চর্য বস্তু বলে পরিগণিত হয়েছে। প্রথম ওয়ালিদ মদিনার মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় বহু স্কুল ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি অন্ধ, খোঁড়া ও কুষ্ঠরোগীদের জন্য অনাথাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। তিনিই প্রথম নবীর মসজিদে মিহ্‌রাব ও আজানের জন্য মিনার নির্মাণ করেন।

৪। **মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ঃ** মসজিদ নির্মাণে অমুসলমান কারিগর ও রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত হলেও এর স্থাপত্যশিল্পে প্রধানত মুসলিম রীতিই অনুসৃত হয়েছিল। কারণ, এটা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রয়োজন এবং রুচি ও নির্দেশ অনুসারে নির্মিত হয়। মসজিদ ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে কোন চিত্রাঙ্কন করা হত না। প্রতিমা ও মূর্তি খোদাই করার পরিবর্তে সুদৃশ্য হস্তলিপি খোদাই করা হত এবং মিহরাব, মিম্বার, মিনার, বিভিন্ন প্রকারের খিলান ও নানা আকারে গম্বুজ নির্মাণ করা হত।

৫। **সুলায়মানের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ঃ** উমাইয়া খলিফা সুলায়মান রামলা শহর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক মুকাদ্দাসীর (বা মাক্‌দিসী) মতে, এটা মার্বেল পাথরের স্তম্ভ ও মেঝে বিশিষ্ট একটি সুন্দর মসজিদ। তিনি আলেপ্পোতেও প্রথম জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

৬। **কুসাইর আমরাহ ঃ** স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে উমাইয়া খলিফাগণ যে কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভ রেখে গিয়েছেন, এদের মধ্যে কুসাইর আমরাহ (আমরাহর ক্ষুদ্র দুর্গ) প্রধান। প্রথম ওয়ালিদ এ দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। লাল রঙের চুনা পাথর দ্বারা নির্মিত এ দুর্গে একটি মিলনায়তন এবং তিনটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট একটি গোসলখানা ছিল। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে অলৌস মুশিল কুসাইর আমরাহ এটা আবিষ্কার করেছিলেন।

১৭.১০ স্থাপত্যশিল্প
Architecture

১। কুব্বাতুল সাখরা মসজিদ ঃ উমাইয়া খলিফাগণ স্থাপত্যশিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলে এবং তাঁদের আমলে এর যথেষ্ট উন্নতি হয়। উমাইয়া খলিফা মাবিয়া মসজিদের মিনারের প্রবর্ত করেন। মাক্‌রিজীর মতে, মাবিয়ার আদেশে মাসলামা আয়ান দেয়ার জন্য মিনার নির্মাণ করেন খারিজিগণ কর্তৃক আক্রান্ত হবার পর মাবিয়া 'মাকসুরা' (Magsurah) প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফ আবদুল মালিক ও তদীয় পুত্র প্রথম ওয়ালিদের রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জেরুজালেমের 'কুব্বাতুল সাখরা'(The Dome of the Rock) প্রথম যুগের মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের সর্বোত্তম নিদর্শন।

প্রথম যুগের মুসলমানদের এটাই প্রথম গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। গম্বুজটি কাঠের নির্মিত ছিল; কিন্তু বাইরের দিক সীসা দ্বারা আবৃত ও অভ্যন্তর ভাগ প্লাস্টার দ্বারা চিত্রিত ছিল। মসজিদের দেওয়ালগুলো অর্ধগোলাকার পাথর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। 'কুব্বাতুল সাখরা' মসজিদটি যেখানে অবস্থিত সে স্থানটির সাথে হযরত মুহাম্মদের (স) মেরাজ জড়িত ছিল বলে মুসলমানগণ একে পবিত্র বলে মনে করে থাকে। কথিত আছে, হযরত মুহাম্মদ (স) এ স্থান হতে মেরাজ উপলক্ষে উর্ধ্বলোক পরিভ্রমণ করেছিলেন। মুসলমানদের নিকট এ মসজিদটি স্থাপত্য সৌন্দর্য ও শিল্পগত মূল্যের চেয়ে আরও অনেক কিছু দাবি করে— এটা তাদের ধর্মবিশ্বাসের জীবন্ত প্রতীক।

'কুব্বাতুল সাখরা' মসজিদে বাইজানটাইনীয় শিল্প পদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠে। সিরিয়ায় সিরীয়-বাইজানটাইনীয় পদ্ধতি, মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে নেস্টোরীয় ও সামানীয় পদ্ধতি এবং মিশরে কপটিক শিল্পের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

'কুব্বাতুল সাখরা' মসজিদের নিকটে আবদুল মালিক 'আকসা মসজিদ' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ৭৭১ খ্রিস্টাব্দে ভূমিকম্পের ফলে এ আকসা মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর এটা পুনর্নির্মাণ করেন।

২। উমাইয়া মসজিদ ঃ সিরিয়ায় দামেশ্‌কের মসজিদ পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সৌধ। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমদিকে স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ওয়ালিদ-বিন-আবদুল মালিক এ মসজিদ নির্মাণ করেন। উমাইয়াদের নামানুসারে তিনি একে 'উমাইয়া মসজিদ' নামে অভিহিত করেন। এ মসজিদের নামাজের জন্য মিহরাব আছে। এর খিলানগুলো ঘোড়ার পায়ের খুরাকৃতি বিশিষ্ট এবং অভ্যন্তরভাগ মার্বেল পাথর ও মোজাইক দ্বারা নির্মিত এবং মসজিদটি সিরীয় বাইজানটাইনীয় শিল্পাদর্শে নির্মাণ করা হয়।

১৬.৫ উমাইয়া বংশের পতনের কারণ
Causes of the Fall of the Umayyad Dynasty

১। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ঃ পৃথিবীর কোন সাম্রাজ্য বা রাজবংশ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে চিরস্থায়ী নয়। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কৃতিত্বের জন্য কোন সাম্রাজ্য বা রাজবংশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে সত্য; কিন্তু কেউই কালের করাল গ্রাস বা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম এড়াতে পারে নি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের মতে, "যে কোন রাজবংশের স্থিতিকাল একশত বছর এবং ক্ষমতাসম্পন্ন রাজবংশকেও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা এবং ক্রমাবনতি ও পতন এ তিনটি নির্দিষ্ট অধ্যায়কে অতিক্রম করতে হবে।" উমাইয়া সাম্রাজ্যও এর ৯০ বছরের (৬৬১ - ৭৫০ খ্রিঃ) স্থিতিকালের মধ্যে উপরিউক্ত তিনটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করে এসেছিল। অতএব, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ছাড়াও উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের পশ্চাতে আরও অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

২। উমাইয়া খলিফাদের অযোগ্যতা ও দোষত্রুটি ঃ উমাইয়া বংশের যে চৌদ্দজন খলিফা সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সুশাসক ছিলেন। মাবিয়া, আবদুল মালিক, ওয়ালিদ ও দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত প্রায় সকলেই শাসক হিসেবে দুর্বল ও অযোগ্য ছিলেন। অধিকাংশ খলিফার দুর্বলতা, অযোগ্যতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন এ বংশের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। একমাত্র দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত অন্যান্য খলিফা ইসলামের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। সাম্রাজ্যের উন্নতির চিন্তা না করে তাঁরা ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। শেষদিকের অধিকাংশ খলিফা মন্ত্রিদের হাতে শাসনভার ন্যস্ত করে মদ, নারী ও সংগীত নিয়ে মত্ত থাকতেন। উমাইয়া বংশের পতনের কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মাসুদী মারওয়ান পরিবারের উচ্চপদস্থ জনৈক ব্যক্তির মন্তব্যকে নিম্নোক্ত কথায় লিপিবদ্ধ করেন, "যে সময় জনসাধারণের কাজে আমাদের মনোনিবেশ করা উচিত ছিল, সে সময় আমরা আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে দিয়েছি। জনসাধারণের উপর আমরা যে গুরু করভার চাপিয়ে দিয়েছিলাম, তা আমাদের শাসন হতে তাদেরকে বিমুখ করেছিল। পীড়াদায়ক করভারে বিরক্ত হয়ে এবং এর প্রতিকারের উপায় না দেখে তারা আমাদের হাত হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিল; আমাদের রাজ্য বিরাণ হয়ে পড়ল এবং আমাদের রাজকোষ অর্থশূন্য হলো

কিন্তু জনগণের কার্য ও চতুর্দিকস্থ ঘটনাবলি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাই আমাদের সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ।"

প্রাচীনকালের সকল সাম্রাজ্যের মত উমাইয়া সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাও এক ব্যক্তি অর্থাৎ খলিফার উপর ন্যস্ত ছিল এবং তিনিই ছিলেন সমগ্র পদ্ধতির প্রাণ; কিন্তু প্রাণ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন দেহ সুস্থ ও সবল থাকতে পারে না। পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ রাষ্ট্রের কার্যে অবহেলা করে হেরেমের ভোগবিলাসে বিভোর হয়ে থাকলে বিরাট সাম্রাজ্যের সমগ্র শাসনপদ্ধতি ধ্বসে পড়তে থাকে। পত্নী-উপপত্নী ও বহুসংখ্যক ক্রীতদাসীতে ভরপুর হেরেমের ন্যায় পাপপূর্ণ বিলাস-গৃহের ক্রমবৃদ্ধি উমাইয়া খলিফা, অভিজাত সম্প্রদায় ও দরবারকে অধঃপাতে নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী যুগের কয়েকজন খলিফা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, যেমন ঃ তৃতীয় ইয়াযিদ, দ্বিতীয় মারওয়ান ও মাসলামা-বিন-আবদুল মালিক ক্রীতদাসীর সন্তান ছিলেন। ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তান বলে নৈতিক চরিত্রের দিক হতে তাঁরা দুর্বল এবং শাসনকার্যে অযোগ্য। পরবর্তী উমাইয়া খলিফা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ মদ, ক্রীতদাসী, সঙ্গীত ও গায়িকাদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদে মত্ত থেকে পারিবারিক জীবনকে কলুষিত করেছিলেন।

৩। **খলিফাদের ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ** রাষ্ট্র শাসনের ব্যাপারে একমাত্র ওমর-বিন-আবদুল আজিজ ব্যতীত সকল উমাইয়া খলিফা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। তাঁরা ধর্ম অপেক্ষা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর অধিক জোর দিতেন। একমাত্র বাইজানটাইম খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধে তাঁরা ইসলামের রক্ষাকারী হিসেবে দাবি করেছিলেন। ইসলামের প্রভাব তাঁদের উপর খুব কম ছিল। তাঁদের জোরপূর্বক খিলাফত দখল অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ করে ধার্মিক, শিয়া ও খারিজিদের অসন্তোষ উৎপাদন করেছিল। তারা উমাইয়াদের অনৈসলামিক শাসন ও আচরণের তীব্র সমালোচনা করতে থাকে। ইসলামের রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থার বদলে খলিফাদের ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব শেষ পর্যন্ত উমাইয়া বিরোধী সম্প্রদায়ের অসন্তোষকে বিদ্বেষ ও শত্রুতায় রূপান্তরিত করে উমাইয়া বংশের পতনকে অনিবার্য করে তোলে।

৪। **মন্ত্রিবর্গের স্বার্থপরতা ও সৈন্যবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা ঃ** মন্ত্রীবর্গের স্বার্থপরতা ও সৈন্যবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকটা দায়ী ছিল। শাসকগণ সাধারণত মন্ত্রীদের বিশ্বাস করে তাঁদের উপর শাসনভার ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিগণ সে বিশ্বাসের অমর্যাদা করে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি ও আকাঙ্খা পূরণের জন্য নিজেদের ইচ্ছামত শাসন পরিচালনা করতেন। ফলে সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অন্যদিকে, সৈন্যদের বেতন বাকি পড়ায় বিপদের সময় তারা শত্রুপক্ষে যোগদান করে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

৫। **হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঃ** আরব জাতির সাম্প্রদায়িক কলহ উমাইয়া বংশের পতনের আর একটি কারণ। আরব জাতির মুদার (হেজাযী আরব) ও হিমার (ইয়েমেনী আরব) গোত্রদ্বয়ের পারস্পরিক কলহ উমাইয়া সাম্রাজ্যের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। মাবিয়া হতে প্রথম ইয়াযিদ পর্যন্ত প্রাথমিক যুগের উমাইয়া খলিফাগণ এ দু'প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতেন। সরকারি চাকরির ব্যাপারে তাঁরা উভয় দলের সাথে সমান ব্যবহার করতেন। কোন একটি বিশেষ দলের প্রতি তাঁদের অনুরাগ থাকলেও তাঁরা এক দলকে অন্য দলের উপর জুলুম করতে দিতেন না।

কিন্তু সুলায়মানের সময় হতে পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ এ বিচক্ষণ নীতি হতে বিচ্যুত হয়েছিলেন। সুলায়মান ইয়েমেনী গোত্রকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে মুদারীয়দের উপর নির্যাতন চালান।

তাঁর ভ্রাতা ইয়াযিদ মুদারীয়দের প্রতি অনুগ্রহশীল ছিলেন এবং হিমারীয়দের প্রতি অত্যাচার করতেন। হিশাম ইয়ামেনীদের অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন এবং দ্বিতীয় ওয়ালিদ মুদারীয়দের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সিরিয়ার ইয়েমেনী গোত্রের সমর্থন লাভ করে তৃতীয় ইয়াযিদ এবং মুদারীয়দের সহায়তায় দ্বিতীয় মারওয়ান ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। এভাবে পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ নিরপেক্ষ নীতি হতে বিচ্যুত হয়ে কোন এক গোত্রের পক্ষাবলম্বন করে এর প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের উপর নির্যাতন চালাতেন।

তাঁদের এ পক্ষপাতিত্ব গোত্রীয় প্রতিহিংসাকে প্রজ্বলিত করে এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের কারণ ঘটায়। প্রত্যেক নতুন খলিফাই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের শাসনকর্তা ও সেনাপতিদেরকে বরখাস্ত করতেন এবং তাঁরা খলিফার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্যাতিত, এমনকি নিহত হতেন। অনুরূপভাবে গভর্নরগণও তাঁদের বিরোধী গোত্রের অধীন কর্মচারীদেরকে যেকোন উপায়ে অভিযুক্ত করে চাকরি হতে বরখাস্ত করতেন এবং তাদের উপর নির্যাতন চালাতেন। এ প্রতিহিংসাপরায়ণতা কেবল শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করে নি, গোত্রীয় প্রতিহিংসাকেও প্রজ্বলিত করেন। মুসলমানদের মধ্যে দু'টি কলহরত বিপক্ষ দল সৃষ্টি হওয়ায় উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

৬। উত্তরাধিকারী নির্বাচনে নির্দিষ্ট নিয়মের অভাব ঃ উমাইয়া যুগে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় সাম্রাজ্যে যথেষ্ট গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল। ইয়াযিদের মনোনয়নের মাধ্যমে উত্তরাধিকার নীতি সূচিত হলেও আরবদের গোত্রীয় আভিজাত্য এ নীতি বাস্তবায়নে যথেষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। এ বংশের চৌদ্দজন খলিফার মধ্যে মাত্র চারজন তাঁদের পুত্রকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালিক এবং তাঁর পর তাঁর পুত্র আবদুল আজিজকে খলিফা পদে অভিষিক্ত করা হলে এ সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠে।

কারণ আবদুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর ভ্রাতাকে বাদ দিয়ে স্বীয় পুত্র ওয়ালিদকে খলিফা পদে মনোনীত করলেন এবং সাথে সাথে তাঁর পুত্র সুলায়মানকে পরবর্তী খলিফা পদের জন্য ইঙ্গিত দান করলেন। খলিফা ওয়ালিদ ভ্রাতাকে বঞ্চিত করে নিজ পুত্রকে খলিফা পদে মনোনীত করার বৃথা চেষ্টা করেছিলেন। উত্তরাধিকারী নির্বাচনের এ হীন প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধের পথ উন্মুক্ত করেছিল। এভাবে সাম্রাজ্য ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

৭। অনারব মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার ঃ অনারবীয় মুসলমানদের (মাওয়ালী বা নবদীক্ষিত মুসলমান) প্রতি আরবীয় মুসলমানদের বৈষম্যমূলক ব্যবহার উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। যে সাম্য-মৈত্রীর উপর বিশ্বনবী মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন, উমাইয়া রাজত্বের শেষভাগে তা লোপ পেয়েছিল। আরবীয় মুসলমানরা, বিশেষ করে পারস্যদেশীয় মুসলমানগণ ইসলামের খেদমতে সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এমনকি, তাদের নিকট হতে মাথাপ্রতি ট্যাক্সও আদায় করা হত।

উমাইয়া খলিফাদের এ বিমাতাসুলভ ব্যবহার সকল অনারবীয় মুসলমানের মনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল এবং তারা উন্নতির পরিবর্তে উমাইয়াদের ধ্বংস সাধনের সুযোগ খুঁজতে লাগল। সত্য কথা বলতে কি, এ অবিচারের ফলে পারসিক মুসলমানদের মনে তাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল। কারণ তারা প্রাচীন সভ্য জাতির উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজদেরকে আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। এবার তারা স্বাধীন হবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। হিট্টি বলেন, "এসব অসুখী নবদীক্ষত মুসলমানদের মধ্যে শিয়া ও আব্বাসীয় মতবাদের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে।"

উমাইয়াদের অদূরদর্শিতার ফলে অনারবীয় মুসলমানগণ তাদের ঘোর শত্রুতে পরিণত হলো এবং উমাইয়া বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করে এর পতনকে ত্বরান্বিত করল। এ প্রসঙ্গে

ঐতিহাসিক ভন্ ক্রেমার বলেন, "অন্য যেকোন ঘটনা অপেক্ষা শাসিত প্রজাদের প্রতি উমাইয়া খলিফাদের বিমাতাসুলভ আচরণ উমাইয়া বংশের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এটা এমন এক ভয়াবহ সামাজিক বিদ্রোহের সূচনা করেছিল যা শুধু উমাইয়াদের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র আরব শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।"

৮। **শিয়া সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ঃ** শিয়া সম্প্রদায়ের বিরোধিতাও উমাইয়া বংশের পতনের জন্য একটি কারণ ছিল। আলীর বংশের সমর্থক শিয়াগণ উমাইয়াদের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। হযরত আলী তাঁর পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের প্রতি উমাইয়া খলিফাদের অন্যায় ব্যবহার তাঁদের অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল। আলী বংশধরদের প্রতি ঘৃণা এবং খুত্‌বাতে তাঁদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ ও কুৎসা রটনা করায় ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই উমাইয়াদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

এমনকি, সুন্নী মুসলমানরাও কুরআন ও হাদিসের নীতি উপেক্ষিত হওয়ায় উমাইয়া খলিফাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। তাঁদের অধিকাংশের নীতিহীন আচরণ, কারবালার হত্যাকাণ্ড, খুতবাতে হযরত আলীর বংশের নিন্দা প্রভৃতি উমাইয়াদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। বিরোধী শক্তি গোপনে তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং সুযোগ পেলেই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করত।

৯। **খারিজি বিদ্রোহ ঃ** খারিজি সম্প্রদায়ের ঘন ঘন বিদ্রোহ উমাইয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। খারিজিরা ছিল গণতান্ত্রিক নীতির সমর্থক এবং তারা উমাইয়াদের বংশগত শাসনকে স্বীকৃতি দেয় নি। শিয়াদের মত তারাও মনে করত যে, ইসলামের সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর উমাইয়া খলিফাদের কোন অধিকার নেই। পরবর্তীকালে খারিজিগণ উমাইয়া বিরোধী শক্তিসমূহের সাথে মিলিত হয়ে উমাইয়া বংশের পতনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এতদ্ব্যতীত, ইরাকি গোত্রেও শত্রুতা, অমুসলমান জিম্মি এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের বৈদেশিক শত্রুরাও উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কাজ করেছিল।

১০। **উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ঃ** মাবিয়া তাত্ত্বিক ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবর্তে গোত্রীয় কৌলিন্যকে ভিত্তি করে একটি আরব রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, আমীর আলীর মতে, একটি নীতির আমূল পরিবর্তন এবং কয়েকটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। হযরত আলীর প্রতি মাবিয়ার আচরণে ও ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাত হানায় উমাইয়া যুগের বিশিষ্ট চিন্তাশীল ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁদের অসহযোগিতা উমাইয়াদের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

এতদ্ব্যতীত, উমাইয়া শাসকদের অসৎ ও অনৈসলামিক জীবন যাপন, কারবালার বেদনাদায়ক ঘটনা, হাজ্জাজের নির্মমতা, কা'বাগৃহের অবমাননা, মক্কা-মদিনা অবরোধ এবং বীর সেনানীদের প্রতি সুলায়মানের নিষ্ঠুর আচরণ জনমনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এ প্রতিক্রিয়ার ফলে উমাইয়া-বিরোধী শিয়া-খারিজি আব্বাসীয় আন্দোলনে শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

১১। **আব্বাসীয় আন্দোলন ঃ** সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে যখন অসন্তোষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তখন আব্বাসীয়গণ প্রচার করতে লাগলেন যে, তাঁরা হযরতের বংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছেন। আলীর বংশ ও আব্বাসীয় বংশ উভয়ই হযরতের অর্থাৎ হাশিমীয় বংশের অন্তর্ভুক্ত। কৌশলে হযরত আলীর (রা) সমর্থকদেরকে নিজেদের দলে এনে আব্বাসীয়গণ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে আন্দোলন আরম্ভ করলেন।

৬। **দাস সম্প্রদায় ঃ** দাস সম্প্রদায় ছিল সমাজের সর্বনিম্ন শ্রেণী। যুদ্ধবন্দীরাই দাসরূপে পরিগণিত হত। উমাইয়া যুগ ছিল রাজ্য বিজয়ের যুগ। তাই দাসদের সংখ্যাও এ যুগে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময় দাসদাসীদের ক্রয়-বিক্রয় একটি লাভজনক পেশা ছিল। দাসদাসীদের ঔরসজাত সন্তানও সমাজে দাস বা দাসী বলেই বিবেচিত হত। রাজপরিবার, অভিজাত ও বিত্তবানদের কার্যে তারা নিযুক্ত হত। ইসলামের শিক্ষা ও মহানবীর (স) আদর্শ উমাইয়া যুগে দাস সম্প্রদায়ের প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত করেছিল। দাস সম্প্রদায়ের প্রতি এ যুগে সম্ভাব্য মানবিক আচরণ প্রদর্শন করা হত। তাদের সামাজিক মর্যাদাও ক্রমাগত উন্নত হচ্ছিল। দাসগণকে প্রভুর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি ভোগের অধিকার দেয়া হয়েছিল।

৭। **সমাজে নারীর স্থান ঃ** দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময় সমাজে পর্দাপ্রথা প্রবর্তিত হলেও সমাজে নারীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। ইমাম হুসাইনের কন্যা সখিনা ও তালহার কন্যা আয়েশা সৌন্দর্য-চর্চা, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। প্রথমে ওয়ালিদের পত্নী উম্মুল বানীম একজন প্রতিভাশালী রমণী ছিলেন। খলিফার উপর তার খুব প্রভাব ছিল। এ যুগে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তাপসী রাবেয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আরও বহু নারী এ যুগে কবিতা রচনা ও আবৃত্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

৮। **পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ** এ যুগের জনসাধারণের পোশাক ছিল সুদৃশ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ। যেসব খলিফা জুম'আর নামাজে যোগদান করতেন তাঁরা শুভ্র পোশাক পরিধান করতেন। তাঁদের মাথায় থাকত সাদা টুপি যার উপরিভাগ ছিল চোখা। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করত। নগরে বসবাসকারী জনগণের পোশাক ছিল ঢিলা পায়জামা ও লাল জুতা। তাদের মাথায় থাকত বিরাটাকৃতির পাগড়ি। অভিজাত নাগরিকেরা রেশমি বস্ত্রে সজ্জিত থাকত। বেদুঈনরা ঢিলা পায়জামা পরত। তারা কটিবন্ধ, কাঁধের উপর চাদর ও মস্তকাবরণ ব্যবহার করত। মেয়েদের প্রচলিত পোশাক ছিল পায়জামা ও কামিজ। তারা ওড়না ব্যবহার করত। বোরকা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। তবে বোরকা পরিহিত মেয়েদের রাস্তায় সচরাচর দেখা যেত না।

১৭.৮ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি
Educational Intellectual Progress

উমাইয়া খলিফাগণ দেশ জয় এবং তাদের শাসনকে সুদৃঢ় ও জাতীয়করণের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করেন এবং আরবি মুদ্রাও প্রবর্তিত হয়। জরুরি অবস্থায় উমাইয়া খলিফাদের পক্ষে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন ও পরিচালনা করার অবসর ছিল না। কিন্তু অসুবিধা সত্ত্বেও উমাইয়া বংশের অনেক শাসকই শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথমদিকে মসজিদ সংলগ্ন স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১। **উমাইয়া খলিফাদের শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ** উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মাবিয়া শিক্ষা বিস্তারের জন্য উদার মনোভাবের পরিচয় দেন। তিনি ইবনে আসাল নামক একজন খ্রিস্টান চিকিৎসককে রাজদরবারে আমন্ত্রণ করে তার দ্বারা অনেক চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। খালিদ-বিন-ইয়াযিদ-বিন-মাবিয়াও উন্নত সাহিত্য রুচি ও দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি, বক্তা ও সাহিত্যরসিক লোক ছিলেন। তিনিই

১৭.৭ উমাইয়া যুগের সামাজিক জীবন
Social Life Under the Umayyads

১। খলিফাদের জীবন প্রণালী ঃ উমাইয়া যুগের খলিফাগণের একটি সুনির্দিষ্ট জীবন পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। খলিফাগণের মধ্যে মাবিয়া সাহিত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি এগুলোর অনুরক্ত ও নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন। এ যুগের অনেক খলিফা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন হতে বিরত ছিলেন এবং তাঁরা ভোগবিলাস ও আড়ম্বরের মধ্যে কাল কাটাতে পছন্দ করতেন। ইন্দ্রিয়পরায়ণ খলিফা প্রথম ইয়াযিদের শাসনামল হতে অভিজাত সমাজে মদ্যপানের প্রচলন দেখা দেয়। একমাত্র দ্বিতীয় ওমরই উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে ভোগবিলাস ও আড়ম্বর হতে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন। রোমান ও পারসিক কায়দায় উমাইয়া খলিফাগণ তাঁদের দরবারে শান-শওকত রক্ষা করতেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ খলিফাগণ উপপত্নী রাখতেন।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন খলিফা ব্যতিরেকে সকলেই মদ্যপানে অভ্যস্ত ও আসক্ত ছিলেন। প্রথম ইয়াযিদ ও দ্বিতীয় ওয়ালিদ মদের আসরেই অধিকাংশ সময় কাটাতেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে খলিফাদের নৈতিক অবনতি ঘটেছিল। তাঁরা সর্বদা গায়িকা ও নর্তকী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে পছন্দ করতেন। দ্বিতীয় ইয়াযিদ হেরেম ও উপপত্নীদের সান্নিধ্য সত্ত্বেও সাল্লামা ও হাবীবা নাম্নী দুইজন গায়িকার প্রতি আসক্ত ছিলেন। চিত্ত ও অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে খলিফাগণ গীতবাদ্য ও নৃত্যের আয়োজন করতেন এবং এ জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন।

গীতবাদ্য ও নৃত্যের প্রতিও খলিফাদের আগ্রহ ও অর্থব্যয় উমাইয়া যুগের সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধশালী করেছিল। উমাইয়া খলিফাগণের অনেকেই অবসর সময় শিকার, ঘোড়দৌড়, পাশা খেলা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ঘোড়দৌড়ের প্রতি উমাইয়া খলিফাদের অত্যধিক আগ্রহ ছিল। তাঁদের সময় এটা একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। শিকার করা অনেক খলিফার কাছেই একটি আনন্দদায়ক ব্যাপার ছিল। শিকারি হিসেবে প্রথম ইয়াযিদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য ছিল।

২। দামেশ্‌কের নাগরিক জীবন ঃ উমাইয়া যুগে দামেশ্‌কে একটি সুন্দর নাগরিক জীবন গড়ে উঠেছিল। এখানকার গণজীবনে আভিজাত্যের ছাপ ছিল। দামেশ্‌ক ছিল উমাইয়াদের রাজধানী। তাঁরা একে আড়ম্বরপূর্ণ ও ঐশ্বর্যশালী নগরীতে পরিণত করেছিলেন। খলিফার প্রাসাদ, অট্টালিকা, ঝরণা, উদ্যান, প্রমোদ ভবন এ নগরীর শোভা বর্ধন করেছিল। এখানকার পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। মাবিয়ার পুত্র ইয়াযিদ 'নাহরে ইয়াযিদ' খালটি খনন করেছিলেন। রাজধানীর সৌন্দর্য বর্ধনে এ খালের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। উমাইয়া যুগে দামেশ্‌ক মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। রাজপরিবার ছাড়াও আরও অনেক অভিজাত সম্প্রদায় এখানে বসবাস করতেন। ফলে দামেশ্‌কে একটি উন্নত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাগরিক জীবন গড়ে উঠেছিল।

সমাজে সাধারণত চার শ্রেণীর লোক বসবাস করত, যথা ঃ আরবীয় মুসলমানগণ বা অভিজাত সম্প্রদায়, মাওয়ালি বা নবদীক্ষিত মুসলমানগণ, জিম্মি বা অমুসলমানগণ (এ সম্প্রদায় খ্রিস্টান, ইহুদি, অগ্নি-উপাসক ও অন্য ধর্মমতে বিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত) ও দাস সম্প্রদায়।

৩। অভিজাতশ্রেণী ঃ অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল খলিফার পরিবারবর্গ, আরব বিজেতাগণ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত আরবগণ। অভিজাতশ্রেণী সরকারি শাসনব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। খলিফার পরিবারবর্গ ও আরব বিজেতাগণ সরকারের নিকট হতে নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা লাভ করতেন। অভিজাতশ্রেণী আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের মধ্যে জীবন যাপন করতেন। দামেশ্‌কে তাদের অবস্থান এ নগরীর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য বর্ধিত করেছিল। তাঁদের বিলাস-ব্যসন ও অবসর জীবন যাপনকে কেন্দ্র করে দামেশ্‌কে একটি নতুন ও উন্নত সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠেছিল। অভিজাতবর্গের অনেকে মক্কা ও মদিনাতে বসবাস করতেন। ফলে এখানকার সংস্কৃতিতেও পারসিক ও বাইজানটাইনীয় রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

৪। মাওয়ালি ঃ আরব সাম্রাজ্যের নবদীক্ষিত মুসলমানগণ ইসলামের ইতিহাসে 'মাওয়ালি' নামে পরিচিত। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর এসব নবমুসলমান নিজেদের নিরাপত্তার জন্য একটি আরব গোত্রের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হত। আরবদের সাথে সাধারণত তারা শহর এলাকায় বসবাস করত এবং বিপদ- আপদের সময় ইসলামের বিজয়ের জন্য তাদের পক্ষে থেকে যুদ্ধ করত। ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে আরবীয় মুসলমানদের তুলনায় তাদের ভূমিকা কোন অংশে কম ছিল না।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী মাওয়ালিরা মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিল। কিন্তু উমাইয়া খলিফাগণ তাদেরকে নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করেছিলেন। ইসলামের জন্য মাওয়ালিরা ধনপ্রাণ বিসর্জন দিলেও আরবীয় মুসলমানদের মত সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সুবিধা তাদেরকে কখনও দেয়া হত না। আরবীয় মুসলমানদের বৈষম্যমূলক ব্যবহার ইসলামী সাম্রাজ্যে শিয়া ও খারিজিসহ সকল সাম্প্রদায়িক দলের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। মাওয়ালিরাও বিভিন্ন সময় উমাইয়া বিরোধী দলে যোগদান করে। এতে উমাইয়া সাম্রাজ্য বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় ওমর রাষ্ট্রের কাজে মাওয়ালিদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাদের প্রতি পূর্বের বৈষম্যমূলক ব্যবহার তুলে দেন। পূর্বে তাদেরকে জিজিয়া ও খারাজ দিতে হত এবং মুসলিম সৈন্যবিভাগে কাজ করলে কোন বেতন দেয়া হত না। দ্বিতীয় ওমর তাদের উপর হতে জিজিয়া ও খারাজ রহিত করেন এবং আরবীয় মুসলমানদের ন্যায় মাওয়ালিদের বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তথাপি পরবর্তীকালে তারা আব্বাসীয় আন্দোলনে যোগদান করে উমাইয়া বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

৫। জিম্মি ঃ জিম্মিদের স্থান ছিল মাওয়ালিদের পরেই। জিম্মিরা ছিল অমুসলমান। জিম্মিরা সাধারণত সামরিক বাহিনীতে যোগদান হতে বিরত থাকত। কৃষিকার্য ছিল তাদের প্রধান পেশা। তারা সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিজিয়া দিত এবং এর পরিবর্তে রাষ্ট্র তাদেরকে দিয়েছিল পূর্ণ নিরাপত্তা ও মুসলমানদের মত সর্ববিধ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার। জিম্মিরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারত। তাদের অপরাধের বিচার তাদের ধর্মীয় বিধানানুযায়ী নিজস্ব পুরোহিতগণের মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হত।

আবদুল মালিক ও দ্বিতীয় ওমরের শাসনামলে জিম্মিদের প্রতি কিছুটা অবিচার করা হলেও গোটা উমাইয়া সাম্রাজ্যে জিম্মিরা মোটামুটি সুখী ও সচ্ছল ছিল। উমাইয়াদের যুগে সরকারি অর্থে জিম্মিদের অনেকে গির্জা, মন্দির ও উপাসনালয় সংস্কার করা হয়েছিল। যোগ্য জিম্মিদের অনেকে উচ্চ রাজকার্যেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। মাবিয়া জিম্মিদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। তিনি একজন খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। মাবিয়ার চিকিৎসক, অর্থসচিব ও সভাকবি খ্রিস্টান ছিলেন।

প্রথম জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্রের উপর গ্রিক গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন। ওমর-বিন-আবদুল আজিজ একজন ধর্মপ্রাণ শাসক ছিলেন।

কথিত আছে, তাঁর আমলে গ্রিক-সংস্কৃতি মিশর হতে এন্টিয়ক এবং হাররানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। হিশাম-বিন-আবদুল মালিক একাধারে যোদ্ধা ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর শাসনামলে অনেক ফারসি গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়েছিল। অনেক পণ্ডিত ও মনীষী প্রথম ওয়ালিদ ও হিশামের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ঐতিহাসিক চিনারী বলেন, "এসব খলিফার দান, বিশেষ করে প্রাচীন রচনা সংরক্ষণ সম্বন্ধে সন্দেহ করা অসম্ভব, কারণ ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে বহু আবৃত্তিকারীর মৃত্যু ঘটায় প্রাচীন রচনাসমূহ লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।" সুতরাং উমাইয়া খলিফাগণ যে শিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন না উপরিউক্ত আলোচনা এরই প্রমাণ। বস্তুত তাঁরাই পরবর্তী বংশধরদের মানসিক উন্নতির পথে অধিকতর অগ্রসর হবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

২। **সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঃ** উমাইয়া যুগে হিজায প্রদেশের মক্কা ও মদিনা, ইরাকের বসরা ও কুফা, সিরিয়ার দামেশ্‌কে এবং উত্তর-আফ্রিকার মিশর ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়, সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে মক্কার গুরুত্ব অপরিসীম। কা'বাগৃহ ও মহানবীর (স) জন্মস্থান হলো মক্কা। প্রত্যেক বছর হজ্ব করার জন্য বিশ্বের মুসলমানরা এখানে সমবেত হন। গুরুত্বের দিক দিয়ে মক্কার পরেই মদিনার স্থান। এটা হযরতের জীবদ্দশায় শুধু ইসলামের কেন্দ্রই ছিল না, তাঁর পরবর্তী তিনজন উত্তরাধিকারীর আমলেও এটা সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। মক্কা ও মদিনা এ উভয় স্থানই ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

৩। **বসরা ও কুফা ঃ** মক্কা ও মদিনার ন্যায় ইরাকের বসরা ও কুফা শহর দু'টি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হতে ছাত্রগণ আরবি উচ্চারণ ও কবিতা আবৃত্তি শিখার জন্য এখানে সমবেত হত। বসরার বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ পড়ার নিয়ম প্রচলিত হয়। বসরাতে আরবি ব্যাকরণের জনক আবদুল আসওয়াদ আল-দুলালী ব্যাকরণ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বিখ্যাত পণ্ডিত খলিল ইবনে আহমদ সর্বপ্রথম আরবি অভিধান রচনা করেন। বসরার ন্যায় কুফা আরবীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান রেখেছে। কুফার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আবদুল্লাহ-বিন-মাসুদ এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের জন্য লোকে তাঁর মুখাপেক্ষী হত। ইবনে মাসুদের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিচারজ্ঞান ছিল।

৪। **সিরিয়া ঃ** সিরিয়া বহু নবীর জন্মস্থান। এটা বহু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। এখানে ফিনিসীয়, কালদীয়, মিশরীয়, হিব্রু, গ্রিক ও রোমান সভ্যতার মিলন ঘটেছিল। এন্টিয়ক, বৈরুত, দামেশ্‌ক, হিমস প্রভৃতি সিরিয়ার নগরগুলো শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এসব কেন্দ্রে সিরিয়াবাসীগণ ফিনিসীয়দের বর্ণমালা, হিব্রুদের নিকট ধর্মতত্ত্ব, গ্রিকদের নিকট দর্শনশাস্ত্র ও রোমানদের নিকট বিচার পদ্ধতি শিক্ষা করেছিল। এসব শিক্ষাই পরবর্তীকালে মুসলিম সংস্কৃতিতে সিরিয়ার প্রভাব অক্ষুণ্ন রেখেছিল।

৫। **মিশর ঃ** মুসলিম সংস্কৃতির প্রথমদিকের ইতিহাসে মিশর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। হযরতের বহু সাহাবা সিরিয়া ও ইরাকের ন্যায় মিশরে বসতি স্থাপন করে অনেক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তাঁরা কুরআন ও হাদিস শিক্ষা দিতেন। এসব পণ্ডিতের মধ্যে আবদুল্লাহ-বিন-আমর-বিন-আ'স সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

ছিলেন মক্কার প্রথম এবং সম্ভবত উমাইয়া যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক। খলিফা আবদুল মালিক তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সমগ্র সিরিয়া ও পারস্য পরিভ্রমণ করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি বাইজানটাইনীয় ও ফারসি গান আরবিতে প্রবর্তন করেছিলেন। এটা হতে বুঝা যায় যে, তিনি আরবের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে সুসংবদ্ধ করেছিলেন।

৩। গায়িকা জামিলা ঃ আল গারিদ, ইবনে মুহাজির ও সা'বাদ শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে উমাইয়া দরবারকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। জামিলা একজন প্রসিদ্ধ গায়িকা ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম যুগের শিল্পীরানী তাঁর গৃহ মক্কা ও মদিনার প্রসিদ্ধ সুরশিল্পীদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয় ইয়াযিদের প্রীতিভাজন হেরেমের গায়িকা হাবীবা ও সাল্লামাহ্ তাঁর ছাত্রী ছিলেন।

১৭.১০ স্থাপত্যশিল্প
Architecture

১। কুব্বাতুল সাখরা মসজিদ ঃ উমাইয়া খলিফাগণ স্থাপত্যশিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁদের আমলে এর যথেষ্ট উন্নতি হয়। উমাইয়া খলিফা মাবিয়া মসজিদের মিনারের প্রবর্তন করেন। মাক্‌রিজীর মতে, মাবিয়ার আদেশে মাসলামা আযান দেয়ার জন্য মিনার নির্মাণ করেন। খারিজিগণ কর্তৃক আক্রান্ত হবার পর মাবিয়া 'মাকসুরা' (Magsurah) প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা আবদুল মালিক ও তদীয় পুত্র প্রথম ওয়ালিদের রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জেরুজালেমের 'কুব্বাতুল সাখরা'(The Dome of the Rock) প্রথম যুগের মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের সর্বোত্তম নিদর্শন।

প্রথম যুগের মুসলমানদের এটাই প্রথম গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। গম্বুজটি কাঠের নির্মিত ছিল; কিন্তু বাইরের দিক সীসা দ্বারা আবৃত ও অভ্যন্তর ভাগ প্লাস্টার দ্বারা চিত্রিত ছিল। মসজিদের দেওয়ালগুলো অর্ধগোলাকার পাথর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। 'কুব্বাতুল সাখরা' মসজিদটি যেখানে অবস্থিত সে স্থানটির সাথে হযরত মুহাম্মদের (স) মেরাজ জড়িত ছিল বলে মুসলমানগণ একে পবিত্র বলে মনে করে থাকে। কথিত আছে, হযরত মুহাম্মদ (স) এ স্থান হতে মেরাজ উপলক্ষে ঊর্ধ্বলোক পরিভ্রমণ করেছিলেন। মুসলমানদের নিকট এ মসজিদটি স্থাপত্য সৌন্দর্য ও শিল্পগত মূল্যের চেয়ে আরও অনেক কিছু দাবি করে— এটা তাদের ধর্মবিশ্বাসের জীবন্ত প্রতীক।

'কুব্বাতুল সাখরা' মসজিদে বাইজানটাইনীয় শিল্প পদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠে। সিরিয়ায় সিরীয়-বাইজানটাইনীয় পদ্ধতি, মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে নেস্টোরীয় ও সামানীয় পদ্ধতি এবং মিশরে কপটিক শিল্পের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

'কুব্বাতুল সাখরা' মসজিদের নিকটে আবদুল মালিক 'আকসা মসজিদ' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ৭৭১ খ্রিস্টাব্দে ভূমিকম্পের ফলে এ আকসা মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর এটা পুনর্নির্মাণ করেন।

২। উমাইয়া মসজিদ ঃ সিরিয়ায় দামেশ্‌কের মসজিদ পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সৌধ। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমদিকে স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ওয়ালিদ-বিন-আবদুল মালিক এ মসজিদ নির্মাণ করেন। উমাইয়াদের নামানুসারে তিনি একে 'উমাইয়া মসজিদ' নামে অভিহিত করেন। এ মসজিদের নামাজের জন্য মিহরাব আছে। এর খিলানগুলো ঘোড়ার পায়ের খুরাকৃতি বিশিষ্ট এবং অভ্যন্তরভাগ মার্বেল পাথর ও মোজাইক দ্বারা নির্মিত এবং মসজিদটি সিরীয় বাইজানটাইনীয় শিল্পাদর্শে নির্মাণ করা হয়।

নবী করীম (স) ও তাঁর প্রধান প্রধান সহকারীদের কার্যাবলি জানার আগ্রহ উমাইয়া যুগের লোককে ইতিহাস রচনা করার জন্য প্রেরণা দান করেছিল। আবিদ-বিন-সারিয়াহ ও ওহাব-বিন-মুনাব্বিহ এ যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আবিদ কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর 'কিতাবুল-মুলক-ওয়া আখবারুল মদিনা' (রাজাদের গ্রন্থ ও পূর্বপুরুষদের ইতিহাস) বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ আমলে হাদিস সংগ্রহের কার্যে যথেষ্ট তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। হাদিস-বিশারদ ও আইনজ্ঞ হিসেবে হাসান-আল-বসরী ও শিহাব-আল-জুহরীর নাম উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়া, আবদুল্লাহ ইবনে সাউদ ও আমীর ইবনে সারাহীল আশ্‌শাবী হাদিস সংগ্রহ কার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৬। **কাব্যচর্চা ঃ** কাব্যচর্চায় উমাইয়া খলিফাগণ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে ওমর-বিন-আবি, রাবিয়া, জামিল, হামদাদ, ফারাজদাক ও আকতালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা কাব্যগগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় উদিত হয়ে উমাইয়া দরবারকে বিভিন্ন সময়ে অলঙ্কৃত করেছিলেন।

৭। **গীতি কবিতা ও বিজ্ঞান চর্চা ঃ** এ যুগ গীতি-কবিতার জন্যও বিখ্যাত। এ দিক দিয়ে কাসিম-বিন-সুলাওয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইতিহাসে তিনি মজনু নামে পরিচিত এবং লায়লার জন্য তাঁর প্রেম আমাদের নিকট প্রবাদে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও উমাইয়া যুগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে আরবে যেসব চিকিৎসাবিদের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আল-হারিস ইবনে কালদার নামই প্রথমে স্মরণ করতে হয়। আরবদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আল হারিস 'আরববাসীদের ডাক্তার' নামক সম্মানজনক উপাধি লাভ করেছিলেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার পুত্র আল-নদর তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। কথিত আছে, ওমর-বিন-আবদুল আজিজ আলেকজান্দ্রিয়া হতে এন্টিক ও ইরাকে মেডিক্যাল স্কুল স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাঁর আমলে বহু গ্রিক গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়েছিল। উমাইয়া বংশের দ্বিতীয় খলিফার পুত্র খালিদ-বিন-ইয়াযিদ চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নের উপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে তৎসম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এসব গ্রন্থ ছিল জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্র সংক্রান্ত।

১৭.৯ সঙ্গীত
Music

১। **সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ** উমাইয়া আমলে সঙ্গীতের চর্চা জনপ্রিয়তা লাভ করে। খলিফাগণ সুরশিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। প্রথম ইয়াযিদ, আবদুল মালিক, প্রথম ওয়ালিদ, দ্বিতীয় ইয়াযিদ, হিশাম ও দ্বিতীয় ওয়ালিদ সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়কদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথমে ইয়াযিদ দামেশ্‌কের দরবারে অনেক বাদ্যযন্ত্র আমদানি করেছিলেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হতে প্রসিদ্ধ সুরশিল্পীদেরকে দরবারে আমন্ত্রণ করে তাদের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করা হত। আরবদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গানের প্রচলন ছিল, যেমন ঃ সামাজিক, ধর্মীয় ও প্রেম সম্পর্কিত গান।

২। **তুয়ায়েজ ও সা'দ বিন মিসজাহ ঃ** উমাইয়া যুগে অনেক বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল। মদিনার তুয়ায়েজকে 'সঙ্গীতের জনক' বলা হত। কথিত আছে, তিনি আরবি গানে ছন্দ প্রবর্তন করেছিলেন। তিনিই প্রথম আরবিতে খঞ্জনির সাহায্যে গান গেয়েছিলেন। সা'দ-বিন-মিসজাহ